Proposed Synopsis

রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph.D. গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে গ্রাম ও নগরজীবনের দ্বান্দ্বিক দর্পণ

Tarashankar Bandyapadhyayer Upanyase Gram O Nagarjibaner
Dwandwik Darpan

2025

Researcher

Asis Kumar Mandal
M.A. Bengali

Under the Supervision & Guidance of

Dr. Barun Kumar Mandal
M.A, BET, Ph. D.
Assistant professor , Bengali
P.P.K College, Bundu
(R.U)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে গ্রাম ও নগরজীবনের দ্বান্দ্বিক দর্পণ

অধ্যায় বিভাজন –

১। প্রথম অধ্যায়ঃ - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্যের দেশকাল।

২। দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঞ্চলিক উপন্যাসের লৌকিকজীবন ও শিল্পজীবন।

৩। তৃতীয় অধ্যায়ঃ - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামজীবনের ও নগরজীবনের আলোকপাত।

৪। চতুর্থ অধ্যায়ঃ - তারাশঙ্করের উপন্যাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং গান্ধীজীর প্রভাব।

৫। পঞ্চম অধ্যায়ঃ - তারাশঙ্করের উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে নাগরিক চেতনা।

৬। ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ - তারাশঙ্করের উপন্যাসে জমিদারতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্বে কৃষিজীবী ও নীচুশ্রেণীর মানুষ।

উপসংহার –

পরিশিষ্ট –

গ্রন্থপঞ্জী –

প্রথম অধ্যায়ঃ – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্যের দেশকাল

উত্তর শরৎচন্দ্র যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তার জন্ম ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৩ শে জুলাই। পরাধীন ভারতবর্ষের বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা প্রভাবতী দেবী। ১৯১৬ সালে লাভপুরের যাদবলাল এইচ. ই. বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য প্রথমে কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং পরবর্তীকালে সাউথ সাবআর্বান কলেজ, অধুনা আশুতোষ কলেজে ভর্ত্তি হন। ছাত্রজীবনেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর সাথে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করতে পারেননি। ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে জঙ্গী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে তাঁকে গ্রামেই গ্রেপ্তার করে আটকে রেখেছিলেন বহুদিন। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে গিয়ে সাহিত্য জীবনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৩২ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন প্রথমবার। ১৯৪০ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার বাগবাজারে বাড়ি ভাড়া করে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। ১৯৪২ সালে তারাশঙ্কর বীরভূম জেলা সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন এবং বাংলায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সমিতির সভাপতি হন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কথাসাহিত্যের আঙিনায় পা রাখছেন তখন একটা যুগের অবসান হতে চলেছে, আর একটা নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। পুরাতন জমিদারী প্রথা ও অবক্ষয় বিদায় নিচ্ছে আর সেই রিক্ত স্থান পূরণ করার জন্য ধেয়ে আসছে শিল্পপতিরা। গ্রাম-জনপদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তোর কালের ছায়া স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার পুর্বাভাস দেখা গেছে 'গণদেবতা' উপন্যাসের শুরুতেই অনিরুদ্ধ ও ছিরুপালের মধ্যে দিয়ে। তাঁরা কিভাবে পুরুষানুক্রমে চলে আসা বৃত্তিকে অবহেলা করে ময়ূরাক্ষী রেল স্টেশনের পাশে দোকান করতে বসেছে। এখানে সূক্ষভাবে অর্থ সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে।

ধাত্রীদেবতা, আরোগ্যনিকেতন, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে একদিকে বীরভূমের অতিসাধারণ শ্রেণীর বেদিয়া, ডোম – বাউরি, কাহার, সাঁওতাল, আউল-

বাউল, বৈষ্ণব প্রভৃতির জীবনের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় ঠিক তেমনি নতুন জীবনালোকের সন্ধানে তারা প্রাচীন সংসারকে আঁকড়ে ধরে বাহিরে বেরিয়ে আসতে চায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক উপন্যাসের লৌকিক জীবন ও শিল্পজীবন –

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মূলতঃ আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক। কল্লোল যুগে তাঁর আবির্ভাব কিন্তু কল্লোলের পরিবর্তনশীল রচনাধারা থেকে তারাশঙ্করের রচনাবলী পৃথক। রাঢ় ভূমির লেখক তাই রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম বাংলার সহজ সরল মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি ফুটে উঠেছে। রাঢ়বঙ্গের মানুষের ধর্ম, সামাজিক-রীতিনীতি, চাওয়া-পাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, পূজাপার্বন, পর্বোৎসব তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিতে ফুটে উঠেছে। লোকায়ত জীবনের রূপান্তর তারাশঙ্কর বীরভূম ও বর্ধমান জেলার প্রান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী নিম্ন মধ্যবিত্ত ও প্রান্তশ্রেণীর জীবনদর্শন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলিতে ছড়িয়ে আছে। সম্ভবত বীরভূমের গ্রামাঞ্চলকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন বলেই তিনি তাদের কথা লিখতে পেরেছেন।

তাঁর উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই (গণদেবতা) যে কী ভাবে ধীরে ধীরে গ্রাম্য সমাজ জীবনে আর্থসামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষি সভ্যতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে নগর সভ্যতা ও যন্ত্রসভ্যতা। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সমাজে ভাঙ্গন ধরতে দেখা দিয়েছে। গ্রামীন অর্থনীতি ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে। উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ কিভাবে সমাজের কাঠামোকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। নানা নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছোটো ছোটো বৃত্তিধারী মানুষ বেদে, ডোম, কাহার, বাউরি, বাদ্যকার, সাঁওতাল মাঝি প্রভৃতি মানুষগুলো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় (উপন্যাস-ছোটগল্প) স্থান পেয়েছে।

বীরভূম রুক্ষ লালমাটির দেশ। বর্ষাকালে চারিদিকে জলপ্লাবিত পরিবেশ, গ্রীষ্মকালে কাঠ ফাটা রৌদ্র বীরভূমের মানুষদের একফোঁটা জলের জন্য বহুপথ অতিক্রম করে যেতে হয়। ‘গণদেবতা’র অনিরুদ্ধ কর্মকার ও গিরীশ সূত্রধর গ্রামীন অর্থনীতি থেকে উৎখাত হয়ে আধুনিক শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চবর্ণের এবং জমিদারের সন্তান হয়েও তিনি সমাজের নীচু স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সেগুলিকে তিনি সাহিত্যে ঠাঁই দিয়েছেন। তিনি কাহার, বাগ্‌দী, ডোম, বাউরি, চণ্ডাল, বেদে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে তাঁর বিভিন্ন

রচনায় উল্লেখযোগ্য স্থান দিয়েছেন। 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'ভুবনপুরের হাট' এই সমস্ত উপন্যাসে তাদের জীবনের নানা দিককে উন্মোচিত করা হয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে কৃষক তাঁর কৃষিজমির মালিকানা হারিয়ে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়েছে, তারপর তাদের স্থান হয়েছে কারখানার শ্রমিকে। তারাশঙ্কর 'চৈতালি ঘূর্ণি'তে সেই বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশে নিরাশ্রয় – বিপন্নতার ছবিটি এঁকেছেন। 'কালিন্দী' উপন্যাসেরও ঘটনা জমিদার বাড়ির শরিকদের বাদ-বিসংবাদকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনা আবর্তিত হলেও এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটও সেই যুগ পরিবর্তনের ইতিহাস, চাষের জমি দখল করছে শিল্প, শিল্পপতিরা। নদীর বুকের চরকে কেন্দ্র করে যে বিবাদ, বিতর্ক সেই চর জমিকে দখল করতে এসেছে শিল্পপতিরা।

'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় দেখা যাচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিকাঠামো বদলে যাচ্ছে। ধনী ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার কাজের জন্য শ্রমিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। জমির কৃষক তৈরি হচ্ছে শিল্পপতির শ্রমিক। করালীচরণের মধ্যদিয়ে কাহার সমাজের এই পরিবর্তনের হাওয়া অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। কাহারেরা তাদের জাতি ব্যবসা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী চন্দনপুর কারখানার শ্রমিকের কাজে যোগ দিচ্ছে। গোটা উপন্যাস জুড়ে চলেছে নবীন ও প্রাচীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

<u>তৃতীয় অধ্যায়ঃ</u> – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে গ্রাম জীবনের ও নগরজীবনের প্রভাব

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু উপন্যাসে দেখা যায় যে গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা ও কৃষি জায়গা নিচ্ছে নগর কেন্দ্রিক শিল্পনির্ভর অর্থনীতি। যার প্রত্যক্ষ প্রমান দেখতে পাওয়া যায় তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' উপন্যাসের শুরুতেই। অনিরুদ্ধ কর্মকার ও গিরীশ সূত্রধর নদীর ওপারে শহরে সেখানে দোকান শুরু করেছে। কারণটা খুব স্বাভাবিক, তাদের জীবিকার জন্য রুজিরোজগার চায়। গ্রামের জনতা একজোট হয়ে এদের বিরুদ্ধে নালিশ করে বৈঠক ডেকেছে বারোয়ারি চণ্ডীমণ্ডপে। চণ্ডীমণ্ডপের এই মজলিশকে কেন্দ্র করে গ্রামের যে চিত্র এখানে দেখা যাচ্ছে, তা বিংশ শতাব্দীর যুগপরিবর্তনের এক বিশিষ্ট ছবি। সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির চাপে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ এখানে সচেতন হয়ে উঠেছে। গণদেবতা উপন্যাসে নিম্নবর্গের বিভিন্ন মানুষ রয়েছে। তার মধ্যে দু'জন মানুষের উত্তোরন ঘটেছে এক দেবনাথ ঘোষ(দেবু

পণ্ডিত), সে নিজের হাতে কৃষিকাজ করেন। স্থানীয় ইউনিয়ান বোর্ডের প্রি প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত(শিক্ষক)। দেবু ঘোষ গ্রামের একজন মান্য ব্যক্তি। দ্বিতীয়জন ছিরুপাল গ্রামের চাষী থেকে বড় সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিনত হয়েছে, প্রধান হয়েছে – শ্রীহরি ঘোষ।

যুগ-কালের পরিস্থিতি গ্রামের মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শহরে। পঞ্চগ্রামের শেষের দিকে গ্রামে ফিরে এসেছে অনিরুদ্ধ কর্মকার; সে কিছু অর্থ উপার্জন করেছে, এখন সে কলের ফিটার মিস্ত্রী, গ্রামের লোক তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে। তারা চলেছে কলে কাজ করার জন্য, গ্রামের চাষীরা পরিণত হচ্ছে শিল্প শ্রমিকে। পল্লিগ্রামের কৃষকজীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে, ডুমকা থেকে সাঁওতালদের এনে কৃষির কাজ করানো হচ্ছে। 'গণদেবতা'র শুরুতে অনিরুদ্ধ কর্মকার আর গিরীশ ছুতারকে শহরের পথে যেতে দেখা দিয়েছিল, আর বাকি লোকেরা গ্রামের মাটি আঁকড়ে ধরে থেকেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে পঞ্চগ্রামের শেষ এরাই সব সেই পথে চলতে বাধ্য হয়েছে। দেবু পণ্ডিতও চোখ মেলে দেখেছে সদ্গোপ চাষীর পল্লীগ্রামের অবস্থা। এই সমস্ত চালচিত্র দেখে দেবু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের জন্য কলে কাজ ঠিক করে দেওয়ার। উপন্যাসের শেষে দেবুর আশারসন্ধানী স্বর্ণকে নিয়ে তার পথচলা - "তাহার নিজের কথা, পঞ্চগ্রামের কথা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সেই পুরানের কথা। নূতন যুগের আমন্ত্রণ – নূতনভঙ্গিতে নূতন চাষার, নূতন আলোয়, নূতন পরিবেশে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-ভরা ধনের সংসার।"

চতুর্থ অধ্যায়ঃ - তারাশঙ্করের উপন্যাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং গান্ধীজীর প্রভাব

তারাশঙ্করের অধিকাংশ উপন্যাসের মূল বিষয় এবং প্রেক্ষাপট গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ। অর্থনৈতিক কারণে জমিদার ও প্রজার মধ্যে সাধারণ বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান দিয়ে জমিদার শোষণ করায় আর্থিক উৎপীড়ন শোষিত প্রজাবর্গ একত্র হয়ে বিরোধিতায় এগিয়ে আসে। এই দুয়ের দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে জমিদার তন্ত্র জড়িত হয়ে আছে। এই সঙ্গে মিলিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, বিপ্লব। তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাজনীতি ও সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। 'চৈতালি ঘূর্ণি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' এই সব রচনাতে রাজনীতির পাশাপাশি মানবতা ও বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। 'ধাত্রীদেবতা'য় জীবন ও রাজনীতি একসঙ্গে মিশে গেছে। ১৯৩০ সালে ডিসেম্বর মাসে তারাশঙ্কর যখন জেল থেকে মুক্তি পান, তারপরই তিনি 'চৈতালি ঘূর্ণি' ও 'পাষান পুরী' দু'খানি উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি দেখাতে চেয়েছেন রাজনীতি সর্বস্ব মানুষের চেহারা এবং ভবিষ্যৎ ভাবনায় মানুষ কতখানি বঞ্চিত।

ধাত্রীদেবতার শিবনাথ এবং গণদেবতার দেবু ঘোষের আদর্শ এই যেন বিশ্বযুদ্ধোত্তোর কালের ভাবনার ফসল। গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শনের তারাশঙ্করেরে বহু রচনায় দেখা যায়। স্বদেশ ও জাতীয়তাবোধেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গান্ধীজীর পথ অনুসরণ করেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ - তারাশঙ্করের উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে নাগরিক চেতনা

তারাশঙ্করের বহু উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের বর্ণনা আছে। যেমন চৈতালি ঘূর্ণি কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী ও ভূবনপুরের হাট ইত্যাদি উপন্যাসে। 'কালিন্দী' উপন্যাসের ... জমিদার বাড়ির শরিকদের বিবাদ-বিসংবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও উপন্যাসের পটভূমিকাও সেই যুগ পরিবর্তনের কথা। কৃষির জায়গাটা দখল করছে শিল্প। সেই কালিন্দীর চরকে দখল করাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর উপস্থাপনা। কালিন্দী উপন্যাসে পরিবর্তনের হাওয়ায় এখানকার গ্রামের মানুষের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে কলকারাখানা নিয়ে। পুরানো পদ্ধতিতে আর চাষের কাজ হয়না, মোটর সংযুক্ত বিদেশী নাঙল চালিয়ে সবকিছু উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রের পেষণে প্রকৃতিও নিষ্পেষিত হতে দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে গ্রামের মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে যন্ত্রসভ্যতায় পা দিয়ে কলকারখানার শ্রমিক হতে চলেছে। গ্রাম থেকে আসা সহজসরল মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হতে দেখা দিয়েছে। অন্যায়ের প্রতিবাদে তারা ধর্মঘট করে। গোষ্ঠী এই অন্যায়ের প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়। কোম্পানীর মালিক শ্রমিকদের কাজের সময় এক ঘন্টা করে বাড়িয়ে দেয়। অবসাদ ও ক্লান্তিতে তাদের চোখে জল আসে, মনে মনে ভাবে সেই ছোট্ট গ্রাম খানিই ছিল ভালো। রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' গ্রন্থে 'লোকহিত' প্রবন্ধে ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের এমনই ছবি তুলে ধরেছেন। বাস্তবতাবোধ ও জমিদারতান্ত্রিক শোষণ, শোষক ও শাসক শ্রেণীর মিলিত অত্যাচারের ফলে চাষীরা গ্রাম ত্যাগ করে কারখানার শ্রমিকে পরিনত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ - তারাশঙ্করের উপন্যাসে জমিদারতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্বে কৃষিজীবী ও নীচুশ্রেণীর মানুষ

তারাশঙ্করের সাহিত্য সৃষ্টি চলাকালীন ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে ইংরেজের হুকুম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ণ দাপট বিশ্ব-ইতিহাস সেই সময় তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন যুদ্ধের রণদামামা। বিশ্বজুড়ে চলছে বিশ্বযুদ্ধ। আর সেই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়ছে লেখনীর মধ্যে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতে অবাধে যাতাযাত শুরু করলেন। তাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প

নির্মাণ ও শিল্প-প্রসারে মনোযোগী হওয়া। নীল – চা – কফির চাষ শুরু হল, বাড়তে থাকলো তুলো এবং পাটের শিল্প, কিন্তু এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প তেমনভাবে বিস্তারলাভ করেনি। অবাধে বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতে শিল্পবাণিজ্যিক প্রসার ও আধুনিকরণ ঘটল না। মূলত কৃষিনির্ভর রাখাই হল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য। তারা বুঝে গিয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর এদেশে অবাধ বাণিজ্যনীতি চলবে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পের উন্নতি তাদের মনে প্রতিযোগিতার মনোভাব জন্ম দিয়েছিল। তাই পরবর্তীতে তারা ভারতের শিল্প উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। 'মন্টেগু চেমসফোর্ড' রিপোট উল্লেখযোগ্য। এই রিপোট অনুযায়ী ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করা হল। পরবর্তীতে বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হতে হল। কিছুটা সরকারি সাহায্য পেয়েও শিল্পের প্রসার ঘটল। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই গেল, বিদেশি দ্রব্যের কেনাবেচার স্বাধীনতা ভারতবর্ষীয় বাজারে যেমনভাবে ছিল, তেমনভাবে কি ভারতীয় পণ্য বিদেশের বাজারে কেনাবেচার সুযোগ ছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষকে বিভিন্ন পণ্যের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হত। সংরক্ষিত শিল্পগুলি প্রসারিত হলেও অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য আধুনিক শিল্পায়ন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তুলো ও পাট শিল্প কিছুটা বৃহৎ আয়তন হয়েছিল মাত্র। সেখানে শতকরা চল্লিশ ভাগ ভারতবাসী নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৌলিকশিল্পের তেমনভাবে প্রসার ঘটেনি। মৌলিকশিল্প অর্থ নিমজ্জিত অবস্থার ভারতবর্ষে নিমজ্জমান হয়ে রইল। ইংরেজরা ভারতীয় সম্পদ ব্যবহার করে ভারতীয়দেরকে বঞ্চিত করল। তারাশঙ্করের লেখনিতে সেই ছাপ সুস্পষ্ট আছে। নীলকর সাহেবের কথা নীলচাষের কথা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা। জোর-জুলুম করে নীল চাষ করতে বাধ্য করা হত ভারতীয় চাষীদের। বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এর প্রতিবাদস্বরূপ লিখলেন 'নীলদর্পণ' নাটক। এই নীলকর সাহেবের দাপট তারাশঙ্করের সাহিত্যেও আভাষিত হয়েছিল।

উপসংহারঃ –

তারাশঙ্কর তার নিজভূমিতে অবাধে নিজ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। দেশের ঐতিহ্য আশ্রিত কাহিনি রচনাতে সে সিদ্ধহস্ত। বীরভূম হল বিভিন্ন ধর্মের এবং তত্ত্বের পীঠস্থান। এখানেই গড়ে উঠেছে শাক্ততন্ত্র, শাক্তপীঠ আবার বৈষ্ণবপীঠ, বৌদ্ধ পীঠ। শৈশবের ছোঁয়াও আমরা কিছুটা পাই। বহু ধর্ম ও বহু মতের মিলনস্থল বীরভূম। আর্য ও অনার্যের মিলনভূমি বীরভূম, তিনি এখানে শিকড়ের সন্ধান পেয়েছেন এবং সাহিত্যে সেগুলিকে প্রতিফলিত করেছেন। তিনি মাটির

গহনে লুকিয়ে থাকা শিকড়ের সন্ধান জানেন, তাই তার লেখনীতেও সেই প্রভাব স্পষ্ট। দেশের লোকসমাজে নানা সংস্কার – বিশ্বাস ও আধ্যাত্মসাধনার আলোকরশ্মি আমরা খুঁজে পায়। তারাশঙ্কর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার কথাকার হলেও শিল্পী সত্ত্বাই ইতিহাসের সার্থক রূপকার নন। খুঁইয়ে যাওয়া ধর্ম ও লোকসংস্কৃতিকে তিনি যতটা সার্থক রূপে শিল্পায়িত করতে পেরেছেন ততটা সার্থক রূপে রূপায়িত করতে পারেননি। তারাশঙ্করের রচনায় রচনা শৈলির শৈথিল্য আছে, আছে নাটকীয়তার মোড়ক, কিন্তু তবুও লোককথার কাহিনিগুলো অকৃত্রিম মনে হয়। ‘কবি’, ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’, ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’, ‘অরণ্যে বহ্নি’ যেন তার লোকসাহিত্যের অপূর্ব বিভায় বিভাবিত।

পরিশিষ্টঃ –

গ্রন্থপঞ্জীঃ -

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস –সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত – অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা – ভূদেব চৌধুরী।

৪। বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। তারাশঙ্কর –দেশ-কাল-সাহিত্য – উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

৬। বাঙ্গালীর ইতিহাস – নীহার রঞ্জন রায়।

৭। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর – সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। বাংলা উপন্যসের সমগ্র ইতিহাস – ক্ষেত্র গুপ্ত।

৯। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার – ভূদেব চৌধুরী।

১০। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্ন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

১১। আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী – জগদীশ ভট্টাচার্য।

১২। সাহিত্যে ছোটগল্প – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

পত্রিকাঃ

১। কোরক

২। দেশ

৩। কৃত্তিবাস

৪। তবু একলব্য

৫। অরণ্য বহ্নি